না-বলা অনেক কথা থেকে গেল

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

বিগত শতকের শেষ দুই দশক, বিশেষ করে আশিতে, মধ্যবিত্ত বাঙালি মনকে উৎস মানুষ যতটা প্রভাবিত করতে পেরেছে, সমগোত্রীয় আর কোনো পত্রিকা তেমন কিছু পেরেছে বলে মনে হয় না। শুধু লেখা, বইপত্র প্রকাশ করেছে তাই নয়, পাঠককে সংবাদ, ভাবনা দিয়ে নিজেদের ও অন্যদের জীবনচর্যাকে, অল্প হলেও, কিছুটা প্রভাবিত করতে পেরেছিল। মফঃস্বল অঞ্চলে, কলকাতায় অনেক পাঠচক্র, কুসংস্কার বিরোধী সংগঠন, বিজ্ঞান ক্লাব ইত্যাদি সংগঠন করার জন্য অশোক অনেক পরিশ্রম করে গেছে। একটা পত্রিকা প্রকাশ করা, তার জন্য লেখা সংগ্রহ করা, মুদ্রণ, বিপণন, অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি যে কতটা কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজ তা যারা নিজেরা করেনি তারা বুঝবে না।

আমার সঙ্গে আশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় বোধ হয় ১৯৮০'র প্রথম দিকে। উৎস মানুষ পত্রিকার পরিকল্পনা করে আমার পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য সে আমার কাছে আসে। বয়সে ১২/১৪ বছরের ছোট। আমি প্রথম থেকেই সাধ্যমত লিখেছি। অশোকের সম্পাদনায় শেষ সংখ্যাতেও আমার একটি লেখা বেরিয়েছে। উৎস মানুষের "আড্ডা" একটা চমৎকার উদ্‌ভাবন। বছরে একবার বসত। বেশিরভাগ আড্ডাতেই আমি গেছি। অশোকের বাড়িতে, অফিসেও গেছি। সেও আমার বাড়িতে এসেছে। তার সাথে প্রীতি ও শ্রদ্ধার একটা সুন্দর সম্পর্ক শেষদিন পর্যন্ত ছিল। চিরকাল কেউ বাঁচে না। অশোকের প্রয়াণ সময়ের অনেক আগেই হয়ে গেল। অনেক তার আশা, স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেল। তাকে না-বলা আমারও অনেক কথা থেকে গেল, না-করা অনেক কাজও। কিন্তু তাকে আমি সম্পূর্ণ হারিয়েছি মনে হয় না। নিভৃত জাগরণে, তন্দ্রায় তাকে দেখতে পাই, শুনি তার কণ্ঠস্বর।

একটি পত্রিকা ছোট একটা ছাপা বই মাত্র নয়, তার অনেক বেশি। বহু লোকের অংশগ্রহণে, পরিশ্রমে, অর্থব্যয়ে চলে। কাজের বৈশিষ্ট্য, তার চরিত্রই নির্ধারণ করে, কারা তার সাথে যুক্ত হতে আগ্রহী হবে। উৎস মানুষকে যারা "মানুষ" করেছিলো, তারাও, আমি যতদূর দেখেছি, সবাই ছিল চমৎকার মানুষজন। অনেক ডাক্তার, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, শিক্ষক, সাধারণ মানুষজন উৎস মানুষকে ভালো বাসতেন, তার উন্নতির জন্য ভাবনা চিন্তা করতেন, পরিশ্রম করতেন। তাঁরা না থাকলে উৎস মানুষ ঐ স্তরে পৌঁছতে পারতই না। তবে সর্বক্ষেত্রে, সবসময়েই কোনো ব্যক্তির ভূমিকা নির্ণায়ক বা নিরূপক হয়েই যায়। নেতৃত্বের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। উৎস মানুষের মূল আইডিয়া, তার চরিত্র, নীতি নির্ধারণ অশোকেরই, অন্তত প্রাথমিকভাবে তো বটেই। উৎস মানুষকে ঘিরে যে 'সার্কেল' গড়ে উঠেছিল সেখান থেকে আমি অনেক বন্ধু পেয়েছি। পেয়েছি ভাল অনেক আইডিয়া, সংবাদ।

অশোকের মাধ্যমে একজন অসাধারণ মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি হাওড়ার রামরাজাতলার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর, অশোকের ভাষায় 'চৈঠা'। বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত আর আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ। শিবকালী ভট্টাচার্যের নামে যে চিরঞ্জীব বনৌষধির বিখ্যাত ১১ খণ্ডের পুস্তকটি সুপরিচিত, তার বেশিরভাগ কাজই চৈতন্য ঠাকুর কৃত। অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতায় চাকুরি করার সময়ে হিন্দুদের পবিত্র শালগ্রাম শিলা আসলে যে গণ্ডকী নদীর একধরনের বড় শামুকের খোল, এইটে অশোক বার করেছিলেন। একজন পুরোহিতকে 'ম্যানেজ' করে তাঁর শালগ্রাম শিলা বেঞ্জিন দিয়ে পরিষ্কার করে দেখে তার শাস্ত্রীয় অবস্থান ও হিন্দুধর্মে তার অসাধারণ আসন সম্পর্কে চৈতন্য ঠাকুরকে দিয়ে একটা বেতার সম্প্রচার করিয়ে ছিলেন। ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া হয়েছে বলে বহু অভিযোগপত্র স্টেশন ডিরেক্টরের কাছে আসে। মামলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অশোক কিছু অস্বস্তিতে পড়েছিল।

মফঃস্বলে, গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষজন পিতা মাতার মৃত্যুর পর লোকজন খাইয়ে, দানধ্যান করে নিঃস্বতর না হবার জন্য, পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, সাড়ম্বর শ্রাদ্ধাদির পরিবর্তে সুন্দর অনাড়ম্বর আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের প্রচলনের জন্য অশোক গ্রামঞ্চলেও গেছে। "নতুন পুরোহিত" হয়ে যেতাম। অসুখ-বিসুখে লোকে তুক-তাক থেকে নিস্ফল অকার্যকারী অনেক রকম আচার অনুষ্ঠান করে যাতে আরো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্যে অশোক অনেক সংবাদ পরিবেশন থেকে অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতাও করেছেন। এরকম একটা বিখ্যাত কাজ জণ্ডিসে ন্যাবার মালা। ড্রাগ অ্যাকশান ফোরাম হবার পর অপ্রয়োজনীয় ওষুধ-বিসুখ, চিকিৎসকদের অজ্ঞতা, দায়িত্বহীনতা প্রভৃতি নিয়েও অনেক লেখা আলোচনার ব্যবস্থা উৎস মানুষ করেছে। উৎস মানুষ গোষ্ঠীর নৈতিক সাহস ও মানবিক মূল্যবোধ ঊনবিংশ শতকের ডিরোজিও প্রভাবিত ইয়ংবেঙ্গলের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

যা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, তা হল চিন্তা ও কর্মের মধ্যে মানবিকতার আবেদন। এই চিন্তাধারা আমাকে একদিকে প্রভাবিত করেছিল, অন্যদিকে করেছিল বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকার চমৎকার পরিমণ্ডল ও ভিন্নতার চিন্তা, যা ছিল বিজ্ঞান ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক। উৎস মানুষের ছিল বিজ্ঞান দিয়ে কুসংস্কার দূর করে মানব মনকে সামাজিক প্রগতির পথে পরিচালিত করা। এটা বহুলাংশেই যে সম্ভব নয়, তা বুঝতে আমার সময় লেগেছিল। আশির দশকের পুরোটাই প্রায় আমি কুসংস্কার বিরোধী, পরমাণুশিল্প বিরোধী, আর পরিবেশ আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে ছিলাম। নিজের অজান্তে আমি এই দুটি পত্রিকার পরিমণ্ডল, তাদের ভাবনা চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত, পরিচালিত হয়েছি।

উৎস মানষের কোন এক সংখ্যায় দেখলাম 'ভাগ্য মানুষের হাতে' এই রকম শিরোনামার প্রবন্ধের একপাশে চিত্রায়ত আছে হাতুড়ি হাতে সবল একটি হাত ; অন্যদিকে হস্তরেখা সমন্বিত আর একটি হাত। জ্যোতিষী ও ভাগ্যগণনা নিয়ে আমার একটা বড় লেখাও বেরিয়েছিল, যার ফুটনোটে

বানরের হস্তরেখার তুলনা দিয়ে কিছু বিদ্রূপও করা হয়েছিল। এই সব রচনার বার্তা সুদূর প্রসারি হলেও তাদের স্থায়িত্ব কি খুব বেশি ? মনে হয় না। অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও তো অনেক লিখেছেন। তাঁর আগে মেঘনাদ সাহা সহ দেশ বিদেশে তো অনেকেই লিখেছেন। বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে যে কুসংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা যায় না, তাদের মতের যে সীমাবদ্ধতা আছে, আস্তে আস্তে তা বুঝেছি ; বিশেষ করে ১৯৮০ সালের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়। মনস্তত্ত্বের শক্তি ছোটবেলার শিক্ষা, 'প্রোগ্রামিং' এর মতো। অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোক সব জেনে শুনেও তো গ্রহণের সময় অনেক হাস্যকর কুসংস্কার পালন এখনো করেই চলেন। স্যার পি. সি. রায়, আলডুস হাক্সলি, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রভৃতি কতলোকের প্রচেষ্টাও তো বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এখান থেকে সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের দিকে আমার আগ্রহ বাড়ে। অশোককে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যা কিছু অবাস্তব, যুক্তিহীন সব কিছুই বিরোধিতার যোগ্য নয়। ব্লেইস পাসকেলের একটি কথা আমি এখনো প্রায়ই বলি দুটিই চরম অবস্থান ; যুক্তিকে একেবারেই বাদ দেওয়া, শুধুমাত্র যুক্তি গ্রাহ্যকেই গ্রহণ করা'। আসলে আমাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, নান্দনিক মূল্যবোধ প্রভৃতি অনেক কিছুই যুক্তিগ্রাহ্য নয়, বাস্তব সম্মতও নয়। অচল, পুরাতন সমাজে থেকে যাওয়া অবশেষ। সে সবের অনেক কিছুই আমাদের সাংস্কৃতিক, নান্দনিক উত্তরাধিকার, যা আমাদের মনে সুখানুভূতি দেয়, শান্তি দেয়, নিরাপত্তা বোধের সঞ্চার করে। সে সবের মধ্যে দিয়ে আমাদের আশা ও আনন্দ বেঁচে থাকে।

অশোক স্বপ্ন দেখতে শিখেছিল, অনেককে শিখিয়েছিলও। চাকরি সে করতো জীবিকার জন্য। আসলে তার মনের যুক্তি ছিল মানুষের কল্যাণ চিন্তায়, সামাজিক মুক্তিরই চিন্তায়। তার নৈতিক সাহস যথেষ্ট ছিল। অনাড়ম্বর ব্যক্তি জীবনেও চিন্তা ও কর্মে বৈরিতা বিশেষ ছিল না। হৃদয়ের অসুস্থতা নিয়েও এত পরিশ্রম, নানান অশান্তি নিয়েও এত কাজ করার জন্যই তাঁকে অকালে আমরা হারালাম। তাঁকে ভালবাসা, শ্রদ্ধা দেখানোর সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হ'ল উৎস মানুষের আদর্শ ও কাজকর্মকে অরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

কোনো মডেল নয়

শ্যামল দানা

'কোনো মডেল নয়, কেস স্টাডি চাই', বারবার বলত অশোক। কোনো মডেলের যান্ত্রিক প্রয়োগ নয়। মডেল বা তত্ত্বকে তথ্যের নিরিখে প্রতিনিয়ত বদল ও পরিমার্জন প্রয়োজন। কোনো কিছু মেনে নিও না, প্রশ্ন করো, যাচাই করো, যুক্তি দিয়ে বিচার করো-এটাই বৈজ্ঞানিক চিন্তার পদ্ধতি। 'উৎস মানুষ'-এর মূল ভাবনা। অশোককে ঘিরেই এই উদ্যোগের সূচনা, আবর্তন।

সময়টা আশির দশকের শুরু, সত্তরের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা তখন থেমে গেছে। সাহিত্য এবং সংস্কৃতি চর্চায় একটা পরিবর্তনের ঢেউ এসেছে। এমনি এক সময়ে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম 'মানুষ' নামের একটি পত্রিকা। সেইসময় আমি ঢাকুরিয়া-লেক বুদ্ধ মন্দিরের উল্টোদিকে উঁচু বাড়িটায় থাকতাম। প্রতিদিনই পঞ্চাননতলা বাসস্টপে নামতে হত অফিস ফেরত। ওখানে একটা মিষ্টির দোকান ছিল। পাশেই ফুটপাতের একটা ম্যাগাজিনের স্টল। একদিন নজরে পড়ল পাতলা কয়েক পাতার একটি পত্রিকা। প্রচ্ছদ, নাম সবই অন্যরকম। বিষয়ও বেশ অভিনব। বাড়ি নিয়ে গিয়ে পড়তে পড়তে অদ্ভুত শিহরন লাগল। মনে হল পেয়েছি এক পরশপাথর, যার অপেক্ষায় ছিলাম।

আরও কয়েকমাস পর আলাপ অশোক ও পবনের সাথে। সম্ভবত অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, শ্যামল (ভদ্র) আমাদের শিয়ালদহ স্টেশনের বৃহস্পতিবারের আড্ডায় এসে বলল, 'মানুষ' পত্রিকার 'ওরা' চাইছে আমরা সাহায্য করি। লোকবলের অভাব। অশোক ও পবন এল একদিন আমাদের আড্ডায়। অশোকের কথা মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। প্রায় আমাদের সমবয়সী এক যুবকের পরিণত ও সুস্পষ্ট চিন্তাভাবনার পরিচয় পেলাম। অশোক বুঝিয়ে বলল কী করতে চাইছে, পত্রিকা চালানোর সমস্যা হচ্ছে কোথায়। অমিত ও প্রদীপ তখন কলকাতা ছেড়ে গেছে। দ্বিধা না রেখে, আমি ও শ্যামল লেগে পড়লাম। ঠিকানা বেশব সেন স্ট্রিটের সরু গলি, দোতলায় নিবারণ সাহার বই বাঁধাইয়ের দোকান। মানুষ পত্রিকার 'ওরা' থেকে 'আমরা' হয়ে গেলাম কখন মনে নেই। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় জমে উঠত আলোচনা। মুড়ি, চায়ের জোগান দিতেন গৌরীবৌদি। নিবারণদা ও গৌরীবৌদির আন্তরিকতা ভোলার নয়, পত্রিকা ও মানুষগুলোর প্রতি গভীর মমত্ব ছিল। একটা বৃহৎ পরিবার। আমার দায়িত্ব ছিল, প্রতিমাসে পত্রিকা ডাকে পাঠানো, দক্ষিণ কলকাতার স্টলগুলোয় পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া। নতুন বিষয়, লেখার সন্ধান করতে, টাকা-পয়সার আদায় হিসেব সবই রাখতে হত। আমরা ছজন-অশোক, পবন, শ্যামল, ভাস্কর, পকাই ও আমি ভাগাভাগি করে নিতাম সব কাজ। 'ন্যাবার মালা', 'সাপ নিয়ে কিংবদন্তি', 'আবিষ্কারের অন্তরালে' লেখাগুলো তখন বেরোচ্ছে একের পর এক। পরের বছরেই জানুয়ারি মাসে বইমেলায় আমরা 'অনুষ্টুপ' পত্রিকার স্টলের গায়ে দড়ি বেঁধে 'মানুষ' ঝুলিয়ে বিক্রি করলাম। মনে পড়ে 'সাপ নিয়ে কিংবদন্তী' বইটির প্রথম প্রকাশ সেই বইমেলায়। সেবারই আলাপ হলো অবনী ঘোষের সাথে। এক রবিবার অশোক আমাদের নিয়ে গেল হাজরা রোডে অবনীবাবুর বাড়ি। নিচু, অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছেন। চরম দরিদ্র। কষ্ট হল ওঁর শারীরিক অবস্থা দেখে। অশোকের কাছে জানতে পারি, সাপ নিয়ে যাবতীয় তথ্য, এই লোকটি নিরলস প্রচেষ্টায় জোগাড় করেছেন ২৪

পরগনার গ্রামে গ্রামে ঘুরে। অশোকই প্রস্তাব দেয়, আমরা রাজি হই, 'উৎস মানুষ'-এর সঞ্চয় থেকে অবনীবাবুকে যৎসামান্য মাসোহারা দিতে।

আমরা তখন সব 'রামগড়ুরের ছানা'। ভুলেই গেছি বয়সোচিত চপলতা। ১৯৮১ সাল, দুর্গাপূজার ছুটিতে আমরা ছ'জন বেড়াতে গেলাম বাঁকুড়া মুকুটমণিপুর। আমার বাড়ি বাঁকুড়া চৌকিমুড়া গ্রামে। গ্রামের বাড়িতে খুব হইচই, মাতিয়ে দিল অশোক, ভাস্কর, পকাই ও শ্যামল। 'রামগড়ুরের ছানা'দের মুখোশটা খসে পড়ল, স্বাভাবিক প্রাণের উচ্ছলতায় ভরে উঠল কয়েকটা দিন। একদিন সবাই গেলাম শুশুনিয়া পাড়াড়ে। দূরে দূরে সারি সারি তালগাছ। কে একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'তালগাছ দুটো কেমন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, যেন আয়নায় একে অন্যের প্রতিবিম্ব'। অবাক বিস্ময়ে সবাই দেখলাম, সত্যিই কি তাই। একটু পাশে সরে যেতেই রহস্যটা পরিস্কার হল। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা গেল, তালগাছ দুটো অনেক তফাতে দাঁড়িয়ে। এও এক দৃষ্টিভ্রম। রসদ পেয়ে গেলাম, নতুন এক বিষয়ে, কিন্তু খেয়াল হল কারো ক্যামেরা নেই। অগত্যা অপেক্ষা করতে হল আরো কিছু দিন। সেই তালগাছের ছবি তুলে বাড়ি ফিরলাম। পরের সংখ্যায় পিছনের পাতায় জোড়া তালগাছের ছবি ছাপা হল।

'উৎস মানুষ'-এর চাহিদা, কলেবর সবই বাড়ছে, পাঠকের সংখ্যা বাড়ছে। সৌমিত্র (শ্রীমানি) প্রায়ই আসত লেখা নিয়ে। বাংলাটাও ওর বেশ দখলে ছিল। আমাদের বানান ভুল ঠিক করে দিত। চিত্ত সামন্ত, রিক্তা, লিজা (লাজি), পূরবী এল। পরে সন্দীপ যোগ দিল, সোজা প্রেসে যেত, প্রুফরিডিং-এর কাজগুলো প্রথমদিকে দেখত, একে একে আরো অনেকে এল। শৃঙ্খলা বাড়তে লাগল, নচেৎ তাল রাখা দায়। বিভিন্ন সংগঠনের ডাক আসতে শুরু হল। তারা চায় 'উৎস মানুষ'-এর আদর্শকে মানুষের মধ্যে প্রচার করতে। দায়িত্ব বেড়ে গেল, বেড়ে গেল কাজের চাপও। সারা সপ্তাহ পত্রিকার যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ, আর প্রতি রবিবার আলোচনা। কখনও চিত্তর দমদমের বাড়ি, কখনওবা পকাইয়ের কেষ্টপুরের বাড়ি। মধুর সাথে ওদের বাড়িতেই আলাপ হল প্রথম, পরে একাত্ম হয়ে গেল। স্মরজিৎ ছিল, কখন গুটু, জ্যোতি এসে যোগ দিয়েছে সময়টা খেয়াল নেই। ঢেঙ্কানলের গুটু। ওরা এসে স্বাস্থ্য ও গণস্বাস্থ্য বিষয়টা গুরুত্ব দিল।

'উৎস মানুষ'-এর সে বড় সুখের দিন। পত্রিকা প্রতিমাসে নিয়মিত বেরোচ্ছে, একের পর এক বই প্রকাশ পাচ্ছে। চারিদিকে প্রশংসা। বহু সেলিব্রেটিও আগ্রহ দেখাচ্ছেন, যোগাযোগ রাখছেন। আনন্দবাজার পর্যন্ত আগ্রহী। আমার একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হল। মনে হল উৎস মানুষ এখন একটা গ্ল্যামার। এ সবকিছুর মাঝে, কুঁকড়ে যেতে লাগলাম, কোথায় যেন টান পড়তে লাগলো, মনের তাগিদটা হারিয়ে ফেলছিলাম। সন ১৯৮৩ শেষের দিক। পত্রিকার অফিসে যাওয়া কমিয়ে দিলাম। দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করতাম। শেষে যাতায়াত বন্ধ করলাম। বুঝলাম, আমি না থাকলেও পত্রিকার কোনো ক্ষতি নেই। দূর থেকে শুনতাম নতুন সব ছেলেরা এসেছে। উৎস মানুষ একটা প্রতিষ্ঠানের রূপ নিচ্ছে। ভাল লাগত ভেবে অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে কিছুদিন মেতে ছিলাম, প্রায় একেবারে সেই শুরুর দিনগুলোয়। সেই সব মুহূর্তের সাক্ষী রয়ে গেলাম। একটা ইতিহাস রচিত হল, যার নাম 'উৎস মানুষ'। অশোকের আকস্মিক মৃত্যুতে সেই ইতিহাসের এক অধ্যায় শেষ হল। অনেক কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল। কিংবা সমাপ্তি বলে কিছু নেই। স্থির বিশ্বাস, ভবিষ্যতে এক নতুন প্রজন্ম কোনো সন্ধিক্ষণে, সময়ের তাগিদে অসমাপ্ত কাজ বহন করবে।

হায়, এ কী সমাপন !

আশীষ লাহিড়ী

২০০০ সালে সিদ্ধার্থ ঘোষ (জন্ম ১৯৪৮), ২০০৮ সালে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৫০)। বাংলার বিজ্ঞান আন্দোলনের ভুবনকে অকালে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেছে দু'জন। সিদ্ধার্থ বাহান্ন বছর বয়সে, অশোক আটান্নয়।

সিদ্ধার্থর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল অশোকের আগেই, বোধহয় ১৯৭৫ সালে। তখন ওকে চিনতাম রাজনীতিমনস্ক বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-লিখিয়ে হিসেবে। অশোকের সঙ্গে ১৯৮০/৮১-তে 'মানুষ' বেরোবার পর যখন আলাপ হল, দেখলাম, এ ছেলেটি তো আমার বহুদিনের চেনা। মিল্ক কলোনিতে আমাদের বাড়ির সামনেই থাকত। কতবার পাড়ায় দেখেছি প্রায় সমবয়সী উজ্জ্বল চেহারার সুদর্শন তরুণটিকে। আলাপ হয়নি। এমনকি ওর দাদা তপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার বন্ধু প্রাবৃট দাসমহাপাত্রের পাঠানো একটি বই পৌঁছে দেবার জন্য ওদের বাড়িতেও একবার গেছি। তবু আলাপ হয়নি পাড়ায়। আলাপ হয়েছিল ভুবনে। সেই ভুবন আজ কাঙাল।

সিদ্ধার্থ আর অশোক স্বভাবের দিক থেকে একেবারে বিপরীত ছিল। সিদ্ধার্থ (ভালো নাম অমিতাভ) ছিল ইংরাজিতে যাকে বলে ফ্ল্যাম্বয়েন্ট ; অশোক সংযত। সিদ্ধার্থ ইঞ্জিনিয়ার (যাদবপুর, মেক্যানিকাল) ; অশোক পদার্থবিজ্ঞানের ডক্টরেট (কলকাতা, ব্যালিস্টিক্স)। সিদ্ধার্থর ঝোঁক ছিল সায়েন্স ফিক্শনের দিকে ; অশোক ছিল সায়েন্স ফিক্শনের ওপর খড়্গহস্ত। বলত, এইসব গল্প লোকের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অকারণ রহস্য তৈরি ক'রে বিজ্ঞানকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়। সিদ্ধার্থের প্রতিভা ছিল বহুমুখী ; রেকর্ড, ক্যামেরা থেকে অংকের ধাঁধা, ক্রিকেট-রচনা, গোয়েন্দা গল্প। অশোকের ছিল অর্জুনের গাণ্ডীব ; লক্ষ্য স্থির। নিজেকে ছড়িয়ে ফেলেনি সে। মানুষের মনে বিজ্ঞানচেতনা জাগাতে হবে, তাকে নিজের মতো করে যুক্তি দিয়ে ভাবা 'প্র্যাকটিস' করাতে হবে, লড়তে হবে বিজ্ঞানসম্মত মানবিক মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে, এই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য। তাকে দেখলে মার্কসের একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে যেত ; একশোটা বড়ো বড়ো তাত্ত্বিক প্রস্তাবের চেয়ে একটা ছোট্ট বাস্তব পদক্ষেপের মূল্য ঢের বেশি।

অগাধ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অশোক নিজের বই লেখার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিল না। বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিয়ে 'কচকচি'তে সে বিশ্বাস করত না।

যেটুকু বিজ্ঞান জানলে সাধারণ, অর্থাৎ অ-বিশেষজ্ঞ মানুষের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনে সুস্থভাবে বাঁচা সম্ভব, ভালোমন্দ, ঠিক-বেঠিক যাচিয়ে নেওয়া সম্ভব, সমাজের শ্রদ্ধেয় ধান্দাবাজদের চিনে নেওয়া সম্ভব, সেটুকু তত্ত্বই যথেষ্ট বলে ও মনে করত। যারা বিজ্ঞানের দার্শনিক দিক বা কূটপ্রশ্ন নিয়ে মেতে থাকত, তাদেরও সমালোচনা করত। আমার নিজের এরকম বদভ্যেস থাকায় ওর সঙ্গে অনেক বার তর্ক হয়েছে। একবার কালিন্দীতে ওর অত্যন্ত স্নেহভাজন অমিত চৌধুরীর বাড়ির 'আকাশি আড্ডায়' জীবনানন্দ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি কোয়ান্টম মেক্যানিক্স ও রিলেটিভিটির ধারণা কবিকে কীভাবে প্রভাবিত করে থাকতে পারে, সে কথা তুলেছিলাম। অশোক যথারীতি বলল, 'এসব কথা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে যেসব অবস্থার মোকাবিলা করতে হয়, তার জন্য নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকানুনই যথেষ্ট ; সেখানে কোয়ান্টম মেক্যানিক্স, এমনকি রিলেটিভিটির প্রসঙ্গ তোলা নেহাত আঁতলেমি'। আসলে ভঙ্গিসর্বস্ব বিজ্ঞানমনস্কতার ওপর খুব রাগ ছিল তার।

'উৎস মানুষ' যখন মধ্যগগনে, তখন অভিজিৎ লাহিড়ী আর সিদ্ধার্থ 'অন্বেষা' সম্পাদনা করতে শুরু করে। আমিও যোগ দিই। তখন সিদ্ধার্থকে কাছ থেকে দেখেছি। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা, বিজ্ঞানের তথ্য সহজ করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, বিজ্ঞানের রোমাঞ্চের স্বাদ গ্রহণের উপযোগী রসনা তৈরী করে দেওয়া, বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করা, এগুলো ওর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। কুসংস্কার তাড়ানো নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু এত অজস্র কুসংস্কারের কাঁটা খুচরো করে তোলা সম্ভব নয়, বলত সে।

সে সময় আমি সিদ্ধার্থের ভাবনার সঙ্গেই বেশি আত্মীয়তা অনুভব করতাম। কিন্তু আজ এতদিন পেরিয়ে আসবার পর মনে হয়, এ দুটি কি পরস্পর-সম্পূরক নয় ? বিজ্ঞান আন্দোলন অতি বৃহৎ ব্যাপার, তাতে এই দুটি ধারারই স্থান আছে এবং থাকা উচিত। কেননা আন্দোলনটা চালাতে হবে নানান স্তরে ; সুন্দরবনের সাপ এবং স্বামী বিবেকানন্দ, ন্যাবার মালা এবং নিউক্লিয়ার শক্তি, পরিবেশ আন্দোলন ও জ্যোতিষের বুজরুকি, এসবই তো বিজ্ঞান আন্দোলনের আওতায় পড়ছে। বাস্তবে, অশোকদের উৎস মানুষ আর আমাদের অন্বেষার মধ্যে একটা সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, অনেক লেখকই দু'কাগজে লিখতেন।

পরে যখন যায়-যায় অবস্থা থেকে বেঁচে উঠল 'উৎস মানুষ', তখন তার অন্দরমহলে কিছুটা প্রবেশ করেছিলাম। অশোকেরই নিরন্তর চাপে সহজ করে নতুন ঢঙে লেখার একটা তাড়না অনুভব করতাম। 'আসুন, বাংলায় ফিরি' নামে যে-লেখাগুলো বেরোত, সেগুলো তার বেশ পছন্দ হয়েছিল। বলত, যাক, এতদিনে আপনি প্যাঁচের লেখা ছেড়ে আমার লাইনে ভিড়লেন ! শুনে, সিদ্ধার্থ হয়তো অলক্ষ্যে মুচকি হাসত।

সিদ্ধার্থের সঙ্গে অশোকের মেরুপ্রমাণ তফাতটা ছিল জীবনচর্যায়। জীবনের কেন্দ্রীয় বন্ধন অল্পবয়সেই হারিয়ে ফেলেছিল সিদ্ধার্থ। প্রেম, সংসার কেরিয়ার সমস্ত বিষয়েই এমন এক উড়নচণ্ডেপনা তাকে পেয়ে বসেছিল যে কোথাও কোনো স্থিরতার আশ্রয় খুঁজে পায়নি সে। যেন এক অমোঘ আত্মঘাতী তাড়নায় অ্যালকোহলিজমে তলিয়ে গিয়ে নিজের ভয়াবহ সমাপ্তি ডেকে এনেছিল।

অশোকের সমস্যাটা একেবারেই অন্যরকম। দুরারোগ্য কার্ডিও-মায়োপ্যাথির রুগি ছিল সে। তিন পা হাঁটলে হাঁফাত। শেষ দিকে সিঁড়ি ভাঙাও বারণ হয়ে গিয়েছিল। নিয়মে বাঁধা জীবন। ওষুধ, অফিস আর বাড়ি। উড়নচণ্ডেপনার তো প্রশ্নই ওঠে না। আক্ষেপ করত, এভাবে বেঁচে কী লাভ বলুন তো ! ইচ্ছে থাকলেও কাজ করতে পারছি না, কোথাও যেতে পারি না ! অনিয়মের মধ্যে কেবল রাত জেগে জেগে উৎস মানুষের কাজ করা। বলত, এটুকু না করলে কাগজ চলবে কী করে ! শেষ যেদিন কথা হয়েছিল, বলল, কাগজ যদি না-ই বার করা যায়, ছোটো ছোটো করে কিছু বই বার করলে কেমন হয় ? বলেছিলাম, বাস্তব অবস্থা যা, তাতে সেটাই বোধহয় ঠিক। এসব আক্ষেপে আসলে তো একেবারে ভেতর থেকে জীবনকে আঁকড়ে থাকারই আপ্রাণ প্রয়াস। কিন্তু ভেতরের সেই চাপেই তার হৃদয় একটু একটু করে ক্ষয়ে গেল। অবশেষে ১৭ নভেম্বর ২০০৮ সব শেষ।

বাইরের চাপ সামলাতে না পেরে চলে গিয়েছিল সিদ্ধার্থ ; ভেতরের চাপ সামলাতে না পেরে চলে গেল অশোক। হায়, এ কী সমাপন ! বিজ্ঞান আন্দোলনের পক্ষে কোথাও কি প্রতীকী তাৎপর্য রেখে গেল এই দুই ভিন্ন সমাপন !

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী। চাতরা শ্রীরামপুর হুগলী থেকে যে চিঠিটি পাঠিয়েছেন তা হুবহু ছেপে দেওয়া হল।

শ্রদ্ধেয় বরুণবাবু,

গত ০৯/১২/০৮ তারিখে আনন্দবাজারের কলকাতা কড়চা বিভাগে উৎস মানুষ পত্রিকার সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণের খবর উল্লিখিত আছে। খবরটা পড়ে মনটা বিষণ্ণতায় ভরে উঠেছে। উৎস-মানুষের পাঠক তথা পূর্বতন গ্রাহক হিসাবে উৎস মানুষ পত্রিকার সাথে যুক্ত সকল মানুষই আমার অত্যন্ত প্রিয়। যদিও আলাদা আলাদাভাবে সকলের সাথে গভীর পরিচয় নেই। তবুও...। বিগত দিনে মাসিক ঘরোয়া সাহিত্য আড্ডায় বেশ কয়েকবার গিয়েছিলাম। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে আছে। আগামী বইমেলায় আশাকরি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে উৎস-মানুষ প্রকাশিত হবে। সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী ১১এ/২, ডা. পি এন মুখার্জি স্ট্রিট। চাতরা - ৭১২২০৪।

আমার দেখা অশোক

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অশোকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়, তাঁর একটি লেখার মাধ্যমে। ১৯৮৩ সাল ডিসেম্বর মাস, আমি তখন কলকাতার পজিশন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টারের ডিরেক্টর। মাঝে মধ্যেই 'উৎস মানুষ' পত্রিকার কপি আমার কাছে এসে পৌঁছত ; এই ডিসেম্বরের সংখ্যায় অশোকের লেখা 'পুনার দরগায় পাথর রহস্য' প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখাটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি পুনায় ১৯৬৫ সালে দেড় বছরের ওপর ছিলাম। এক রবিবার আমি ও সাত-আট জন শিক্ষার্থী বেড়াতে গিয়েছিলাম, শহর থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে কামার আলী দরবেশের দরগায়, ছোট একটা টিলার ওপর এই দরগা। শুনে এসেছিলাম এই দরগায় এক ভারী পাথর শূন্যে ভেসে ওঠে স্রেফ 'দরবেশ' বলে চেঁচিয়ে উঠলে। স্বচক্ষে দেখলাম, দশ-বারো জন মানুষ পাথরের নীচে আঙুল ঠেকিয়ে একযোগে 'কামার আলী দরবেশ' বলে চিৎকার করছে, আর সত্যিই পাথরটা খানিকটা ওপরে উঠে গেল। আমার সঙ্গে শিক্ষার্থী হিসাবে চারজন এয়ার ফোর্সের অফিসারও ছিলেন, তারা সকলেই বলে উঠলেন—এ এক অপরূপ দরবেশের মাহাত্ম্য। আমার মন এটা কিছুতেই মানতে চায়নি, আমি খানিকটা প্রতিবাদও করেছিলাম, কিন্তু এয়ার ফোর্সের অফিসাররা আমার প্রতিবাদ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন। আমি সম্পূর্ণ একা, তাই সেদিন আর কিছু বলতে পারিনি। অশোকের লেখাটি পড়ে দরবেশের মাহাত্ম্য পরিষ্কার হয়ে গেল। এই লেখাটাই আমাকে অশোকের একান্ত গুণমুগ্ধ করে তোলে।

তারপরে কত 'উৎস মানুষ'-য়ের কপি পেতে লাগলাম, সেই পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে অশোককে দেখলাম বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার এক অপরূপ উন্মাদনা।। 'উৎস মানুষ'-য়ের প্রতিটি সংখ্যা পেরেছে মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে, তাঁরা কী সাংঘাতিক কুসংস্কার ও যুক্তিহীন ভুল বুঝবার মধ্যে ডুবে আছেন। এই 'উৎস মানুষ' সম্পাদনার পেছনে ছিল অশোকের সম্পূর্ণ নির্ভীকতা, কোনোওরকম কাউকে এতটুকু গ্রাহ্য করেনি। সাধারণত দেখা যায়, যে সময়ে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেই সময়কার রাজনৈতিক দল, যারা শাসনব্যবস্থায় থাকে, তাদের সমীহ করে লেখাগুলো প্রকাশ করা। অশোক কোনদিনও এ পথে হাঁটেনি, অকপট সত্য প্রকাশ করে অনেক শাসনব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছে সম্পূর্ণ যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তি করে—এ ব্যাপারে অশোক ছিল অসাধারণ। অশোকের সর্বদা চেষ্টা ছিল, মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক কেমন করে করা যায়—আসলে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলাই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান, এই একটা দারুণ বড় মাপের কাজের জন্যই যেন অশোকের আবির্ভাব।

২০০০ সালের একেবারে শেষের দিকে ভারত সরকারের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পরিকল্পনা করে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ানোর। প্রতিবাদ করে আমি লিখেছিলাম, 'জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?' ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে বইমেলা, আমি মেলার দিন কুড়ি আগে অশোককে টেলিফোনে বইখানি ছাপতে অনুরোধ করি। অশোক এক কথায় রাজি হয়ে যায়। তখন অশোকের শরীরের অবস্থাও ভাল ছিল না, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে নিজে প্রেসে গিয়ে বসে থেকে আমার বইটি ছাপিয়ে ওই বইমেলায় প্রকাশ করেছিল। জ্যোতিষের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল অশোকের আর এক লক্ষ্য, আর এই লক্ষ্যভেদের জন্যেই এত অমানুষিক পরিশ্রম করেছিল। বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে আমি অশোকের কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।

প্রভাব কিন্তু রয়ে গেল

নিরঞ্জন বিশ্বাস

১৯৮৯ এর ডিসেম্বরে 'উৎস মানুষ' পত্রিকার দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় উৎস মানুষ পত্রিকার পাঠক গোষ্ঠীর একটি মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। মূল বক্তা ছিলেন দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রারম্ভিক বক্তব্যে অশোকবাবু একটা জায়গায় বেশ জোর দিয়ে বলেন, যদি 'উৎস মানুষ' পত্রিকার প্রকাশ এবং যাবতীয় কাজকর্ম এই মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে যায়, তবে কি মনে করতে হবে 'উৎস মানুষ'-এর দশ বছরের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে যুক্তির পথ ধরে চলার যে অঙ্গীকার নিয়ে উৎস মানুষের পথ চলা শুরু, সে চলার পথে 'উৎস মানুষ'-এর আর কোনো অবদান রইল না—ব্যাপারটা কি তাই? উত্তরটা তিনিই দিলেন। বললেন, 'উৎস মানুষ'-এর শিক্ষায় মানসিক জগতের আবিলতা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে যে পরিমাণে দূরীভূত হয়েছে সে পরিমাণেই ব্যক্তি ও সমাজ এগিয়ে যাবে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তা বিকশিত হবে। উৎস মানুষের টিকে থাকা, না থাকার ওপর তা পুরোপুরি নির্ভর করছে না। অশোকবাবুর বিশ্লেষণের আলোকে আমাদের হরিণঘাটা এলাকার দু'একটি কাজকর্মের উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, আমাদের কাছে উৎস মানুষ ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় সমার্থক। উনি আমাদের উল্লেখযোগ্য কাজগুলির প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কয়েকবার আমাদের এলাকায় এসেছেন, অংশ নিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন।

উৎস মানুষ পত্রিকার লেখাপত্র ভালভাবে বোঝার জন্য উৎস মানুষ পাঠচক্র গড়ে ওঠে। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মাশ্রয়ী উৎসব-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি যুক্তিনির্ভর পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক চলতে থাকে। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে পূজা-পার্বণ, ইদ-মহরম, বড়দিনের উৎসবের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে ১৯৮২ সালে গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব। আজ গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব পল্লবিত, বিকশিত। একটি গ্রামে প্রথম পাশাপাশি পারিবারিক মরণোত্তর কাজ, শ্রাদ্ধাদির পরিবর্তে স্মৃতিচারণ সভা, ১৯৮৩ সনে শুরু হয়। এই কয়েক বছরে আমাদের এলাকার স্মৃতিচারণ সভার সংখ্যা ত্রিশ ছাড়িয়ে গেছে। স্মৃতিচারণ সভাগুলিতে যুক্তিবাদী-ভাববাদী মানুষের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করার মত। আমাদের এলাকার গ্রামীণ, আন্তগ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব স্মৃতিচারণসভা সকল অনুষ্ঠানেই অশোকবাবুকে উৎসাহী আপনজন হিসাবে পেয়েছি।

পরিশেষে বলি, অশোকবাবু আজ আমাদের স্মৃতিতে, নিষ্ঠায়, আন্তরিকতায়—যুক্তির পথে চলার পথিকরূপে সতত বর্তমান, মৃত্যু তাঁকে মুছে ফেলতে পারেনি, সে জায়গায় সে হেরে গেছে, পত্রিকাগোষ্ঠী 'উৎস মানুষ' প্রকাশনার দায়িত্ব ধরে রাখতে পারবেন কিনা জানি না,—তা সত্ত্বেও এতটুকু আশা রাখা অত্যুক্তি হবে না যে, উৎস মানুষ ও অশোকবাবু থেকে অনুপ্রাণিত গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব ও স্মৃতিচারণসভা যত দিন যাবে তত মাটিতে শিকড় গজিয়ে আঁকড়ে থাকবে এবং শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হবে। এর মাঝেই অশোকবাবু তথা উৎস মানুষের সৃষ্টি বেঁচে থাকবে।